দায়িত্ব অর্পণ করতাম না; কিন্তু যেহেতু আপনার পুরস্কার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি এরূপ করিনি। এভাবে আপনার দায়িত্বে বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহ্‌র নিয়ামত)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্য ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং কোরআন দ্বারা (অর্থাৎ কোরআনে যেসব প্রমাণ উল্লিখিত আছে, যেমন এখানেই তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা) তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। (অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, সবাইকে বলুন, বারবার বলুন এবং মনে অটুট বল রাখুন। এ পর্যন্ত যেমন করে এসেছেন, তা অব্যাহত রাখুন। এরপর আবার তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, তৃপ্তিদায়ক এবং একটির পানি লোনা, বিস্বাদ এবং (দেখার মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে (স্বীয় কুদরত দ্বারা) একটি অন্তরায় ও (সত্যিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (যা স্বয়ং প্রকাশ্য ও অনুভূত নয়; কিন্তু তার প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্বাদের পার্থক্য অনুভূত ও প্রত্যক্ষ। এখানে 'দুই সমুদ্র' বলে এমন স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। এরূপ স্থানে পানির পৃষ্ঠদেশ এক মনে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কুদরতে নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকে। ফলে সঙ্গমস্থলের একদিকের পানি মিষ্টি এবং নিকটবর্তী অপরদিকের পানি লোনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যেস্থানে মিঠা পানির নদী-নালা সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়, সেখানে দেখা যায় যে, কয়েক মাইল পর্যন্ত মিষ্ট ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত হয়। ডানদিকে মিঠা পানি এবং বামদিকে লোনা ও তিক্ত পানি অথবা ওপরে নিচে মিঠা ও তিক্ত পানি আলাদা-আলাদা দেখা যায়। মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বয়ানুল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাঙালি আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নদীর দুই দিকে সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদা দু'টি নদী দৃষ্টিগোচর হয়। একটির পানি সাদা ও অপরটির কালো। কালো পানিতে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি স্থির থাকে। সাম্পান সাদা পানিতে চলে। উভয়ের মাঝখানে একটি স্রোতরেখা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে; এটা উভয়ের সঙ্গমস্থল। জনশ্রুতি এই যে, সাদা পানি মিষ্ট এবং কালো পানি লোনা। আমার কাছে বরিশালের জনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় একই সাগর থেকে নির্গত দু'টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্ট ও সুস্বাদু। আমি গুজরাটে আজকাল যে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডাভেল, জেলা সুরাট) সমুদ্র এখান থেকে প্রায় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের নদীগুলোতে সব সময় জোয়ার-ভাটা হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনা এই যে, জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের পানি নদীতে প্রবেশ করে, তখন মিঠা পানির উপরিভাগে লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত

হয়। কিন্তু তখনও উভয় পানি পরস্পর মিশে যায় না। ওপরে লোনা পানি থাকে এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় ওপর থেকে লোনা পানি সরে যায় এবং মিঠা পানি যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। والله اعلم এসব সাক্ষ্য প্রমাণদৃষ্টে আয়াতের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও একাকার হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক থাকে।) তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীর্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সেমতে বাপ, দাদা ইত্যাদি শরীয়তগত বংশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বংশ। জন্মের সাথে সাথেই তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও কুদরতের প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ বীর্যকে কিরূপে রক্তবিশিষ্ট করে দেন এবং এটা নিয়ামতও; কারণ, এসব সম্পর্কের ওপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান। (আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ সত্তা ও গুণাবলী দৃষ্টে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত ছিল; কিন্তু) তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা (ইবাদত করার কারণে) তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং (ইবাদত না করলে) কোন অপকারও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকারী। (কারণ, তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ জ্ঞাত হয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে কেবল (মু'মিনদেরকে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদেরকে দোযখ থেকে) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (তারা বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনার কি ক্ষতি? আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এরূপ চিন্তাও করবেন না যে, তারা যখন আল্লাহ্‌র বিরোধী তখন আল্লাহ্‌র দিকে আমার দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে না; বরং তারা আমার স্বার্থপরতা ভেবে এদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। অতএব অন্তরায় দূর করার জন্য তাদের ধারণা কিরূপে সংশোধন করা যায়? সুতরাং তাদের এই ধারণা যদি আপনি ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন, তবে,) আপনি (জওয়াবে এতটুকু) বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (অর্থাৎ প্রচারকার্যের জন্য) কোন (অর্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় চাই না। তবে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌঁছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, (আমি অবশ্যই তা চাই। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টেরও আশংকা করবেন না; বরং প্রচারকার্যে) সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং (নিশ্চিন্তে) তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশংকায় তাদের জন্য দ্রুত শাস্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি (আল্লাহ্‌) বান্দার গোনাহ্‌ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। [তিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, শাস্তি দেবেন। সুতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মনোকষ্ট ও

চিন্তা দূর করা হয়েছে। অতঃপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে] তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (—যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ এভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর জন্য উপযুক্ত; এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূর শুরুর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর (যে তিনি কিরূপ? কাফির ও মুশরিকরা কি জানে। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই তারা শিরক করে; যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর, তখন (মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে) তারা বলে, রহমান আবার কে? (যার সামনে আমাদেরকে সিজদা করতে বলছে?) তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সিজদা করব? এতে তাদের বিরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম প্রচলিত ছিল; কিন্তু জানত না, এমন নয়। তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে যে তাদের তীব্র বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তায়ও তারা সযত্নে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটিরও তারা বিরোধিতা করে বসে।) কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে বৃহদাকারের নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি বৃহৎ উজ্জ্বল ও উপকারী নক্ষত্র অর্থাৎ) তাতে (আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সম্ভবত প্রখরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রাত্রি ও দিনকে একে অপরের পশ্চাৎগামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রমাণ ও আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) সেই ব্যক্তির (বোঝার) জন্য, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। কারণ, এতে সমঝদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিয়ামত বর্তমান। নতুবা

اگر صد باب حکمت پیش نادان
بخوانی آیدش با زیچہ در گوش

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহ্র কুদরতের অধীন ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ—রৌদ্র ও ছায়া দুইটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রৌদ্র না আসলে

মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই পক্কতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহ্র কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণকর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য

পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্য অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্রছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত। এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا-এর অর্থ তাই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا—অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্য নির্ধারণ করার মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে ঃ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا—আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের ওপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سُبَاتٌ এমন বস্তু, যদ্দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হত। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ, তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হত যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তা তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হত। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হত।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। فتبارك الله احسن الخالقين

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا বাক্যে দিনকে نشور অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হত।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও

রেস্তোরাঁ এ সব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا — طهور শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طهور বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি—যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনি-ভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তফসীর মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহ্র সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا — اناسى শব্দটি انسى-এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, انسان এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কি? এতে তো বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির ওপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের

অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ — আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহ্র নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আযাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আযাব ও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ ঃ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا — এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে অর্থাৎ কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا — مرج শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مرج বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। عذب মিঠা পানিকে বলা হয়। فرات-এর অর্থ সুপেয় ملح-এর অর্থ লোনা এবং اجاج-এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। এক, সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের

মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত, এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্তু পরস্পরে মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا —পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে صهر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ, একা মানুষ কোন কাজ করতে পারে না।

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا —

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকার নেই যে, যার মনে চায়, সে আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করবে, বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ

যেমন কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক—এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজ করে, এই সৎ কাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সে-ও পাবে।—(মাযহারী)

فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا —অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা, অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের ওপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহ্‌র কাজ। এ বিষয়ের সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল।—(মাযহারী)

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ رحمن -আরবী শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত; কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে আবার কি।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত একারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা ও তওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত

হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায়; অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কোরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতি-ক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত—এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন মাস'আলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেন নি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশি কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কোরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করি। সূরা হিজরের وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, সূরা আল-ফুরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিম্নরূপ ঃ والله الموفق

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী ঃ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا -এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, بروج অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা, فى অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনি-ভাবে সূরা নূহে আছে ঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا—نُورًا —এতে فِيهِنَّ--এর সর্বনাম سَبْعَ سَمَاوَاتٍ--কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে।

কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআনে سماء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سماء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سماء বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سماء শব্দের অর্থের মধ্যে দাখিল। وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ও এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টত উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ এতে مُزْن শব্দটি مُزْنَةٌ--এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা। আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا এখানে معصرات--এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তফসীরবিদ سماء শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سماء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক—উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فى السماء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশ-লোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে। বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন ঃ এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্ট-জগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌ-কিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করে নি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরি-মণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় নি—এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায় নি। কোর-আন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, হ্যাঁ সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মান-মন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরী করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেন নি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হত, তবে এর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল; বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও

ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ)-র পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তত-টুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনু-মানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মন-যিলে-মকসূদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এসম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলূক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি ঃ প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়। বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত جعلنا فى السماء بروجا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয় নি। আজকাল মহা-শূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্যে থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের كل فى فلك يسبحون আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বোঝা যেত।

এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশত এগুলোকে কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলূসী বাগদাদীর তফসীরে রূহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষিগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌর-বিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লেখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহ্মূদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম اما دل عليه القران مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলিমের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয় নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ

رأيت كثيرا من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة على انها لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولم نؤول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول بل لابد ان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل كل منهما يصدق الاخر ويؤيده -

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহ্র বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহ্য় সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষিগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী, তাতে কোন না কোন ত্রুটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খৃস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ব্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খৃস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবী গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানিগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান আলবেরূনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর

মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না, বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে।

অতপর লিখেন ঃ

> এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন ঃ

> কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে!

অতপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন ঃ

> খৃস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই

আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্ট জগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্ট জগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকাবিলায় অতিসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্ট জগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারকতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারিগণও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে ঃ মানুষের চেষ্টা-সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও ; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি-অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হত, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্য অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ্ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্ট জগত সম্পর্কে

চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তারই নাম আল্লাহ্। দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য---কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্ট জগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দু'টি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোর-আন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ 'তওফীকুর রহমান'-এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধি-কাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কোরআন, সুন্নাহ্ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেন নি এবং পূর্ববর্তী মনীষিগণের উপদেশ এই যে ঃ

زبان تازه کردن باقرار تو — نینگیختن علت از کار تو
مهندس بسے جویرا زراز شاد — نوا نرکچود کردی آغاز شاد

সূফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন ঃ

چه شبها نشستم درین سیر گم — که حیرت گرفت آستینم کهقم

হাফেয শিরাজী নিজের সুরে বলেছেন ঃ

سخن از مطرب و می گوئی و راز دهر کمتر جو
که کس نکشود و نکشاید بحکمت این معما را

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে

চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যন্ত্রতন্ত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থী আলিম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا
لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِيْنَ
لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا
بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا
دُعَاۗؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

(৬৩) 'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহ্‌কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের

পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

'রহমান'-এর (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নম্রতা তাদের নিজেদের কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহ্‌র কলেমা সমুচ্চে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা (আল্লাহ্‌র সাথে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদারত ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ নামাযে রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌কে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আযাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। (দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা) এবং (আর্থিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করে না) এবং কৃপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয় করতে ত্রুটি করে না। বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অযথা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় গোনাহ্। যে বস্তু গোনাহ্‌র কারণ হয়, তাও গোনাহ্। কাজেই পরিণামে তাও গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়ে যায়। এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা لَمْ يَقْتُرُوا থেকে জানা গেল। কারণ কম ব্যয় করা যখন জায়েয নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ত্রুটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও বাড়া-বাড়ি

থেকে পবিত্র।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের (অর্থাৎ ত্রুটি ও বাড়াবাড়ির) মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। (তাদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) এবং যারা (গোনাহ্ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না (এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত গোনাহ্), আল্লাহ্ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে) অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের কোন শরীয়তসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা)। এবং ব্যভিচার করে না। (এই হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত গোনাহ্)। যারা এ কাজ করে (অর্থাৎ শিরক করে অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যভিচারও করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা করত) তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে (যেমন অন্য আয়াতে আছে زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ এবং তারা তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে (যাতে দৈহিক শাস্তির সাথে সাথে লাঞ্ছনার আত্মিক শাস্তিও হয় এবং শাস্তির কঠোরতা অর্থাৎ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয়। وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ বলে কাফির ও মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত امن - مهانا - يخلد - يضاعف ইত্যাদি বাক্য। কেননা, পাপী মু'মিনের শাস্তি বর্ধিত ও চিরস্থায়ী হবে না; বরং তাকে পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে, লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর জন্য ঈমানের নবায়ন জরুরী নয়---শুধু তওবা করা যথেষ্ট। পরবর্তী وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস থেকে শানে-নুযুলও তাই বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে); কিন্তু যারা (শিরক ও গোনাহ্ থেকে) তওবা করে (তওবা কবূলের শর্ত এই যে) বিশ্বাস (ও) স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা, জাহান্নাম তাদেরকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না; বরং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অতীত) গোনাহ্কে (ভবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত কুফর ও গোনাহ্ ইসলামের বরকতে মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সৎকর্মের কারণে পুণ্য লিখিত হতে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।) এবং (এই পাপ মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, (তাই পাপ মোচন করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তাই পুণ্য স্থাপন করে দেন। এ ছিল কুফর থেকে তওবাকারীর বর্ণনা। অতপর গোনাহ্ থেকে তওবাকারী মু'মিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন সময় গোনাহ্ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা

করেছেন। অর্থাৎ) যে ব্যক্তি (গোনাহ্ থেকে) তওবা করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে,) সে (ও) আযাব থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ ভয় ও আন্তরিকতা সহকারে, যা তওবার শর্ত। অতপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (যেমন খেলাধুলা ও শরীয়তবিরোধী কাজে) যোগদান করে না এবং যদি (ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিয়াকর্মের কাছ দিয়ে যায়, তবে গম্ভীর (ও ভদ্র) হয়ে চলে যায় (অর্থাৎ তাতে মশগুল হয় না এবং কার্যকলাপ দ্বারা গোনাহ্গারদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে তার (বিধানাবলীর) উপর পতিত হয় না (কাফিররা যেমন কোরআনকে অভিনব বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এর স্বরূপ ও তত্ত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত। অন্য আয়াতে কোরআন বলে ঃ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا —উল্লিখিত বান্দাগণ এরূপ করে না; বরং বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে— কোরআনের প্রতি আগ্রহভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রমাণিত হয়; কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধ বধিরের পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিন্দনীয়) এবং তারা (নিজেরা যেমন দীনের আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে। সেমতে কার্যত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) দান কর। (অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে এই প্রচেষ্টায় সফল কর, যাতে তাদেরকে দীনদার দেখে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।) এবং (তুমি তো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমাদের দোয়া এই যে, তাদের সবাইকে মুত্তাকী করে) আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাতে দোষ নেই; বরং আসল উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মুত্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থাৎ আমরা এখন শুধু পরিবারের নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুত্তাকী পরিবারের নেতা করে দাও। এ পর্যন্ত রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তাদেরকে (জান্নাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের (ধর্ম ও ইবাদতের উপর) দৃঢ়তর থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জান্নাতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) স্থায়িত্বের দোয়া ও সালাম পাবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত

سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান। (যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। হে পয়গম্বর,) আপনি সাধারণভাবে লোকদেরকে বলে দিন, আমার পালনকর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব (এ থেকে বোঝা উচিত যে, হে কাফির সম্প্রদায়) তোমরা তো (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে) মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্বর এটা (অর্থাৎ মিথ্যা মনে করা তোমাদের জন্য) অনিবার্য বিপদ হয়ে যাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ এসেছে কিংবা পরকালে হোক---এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আল্-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্ ও রসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসমঞ্জস।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'—(রহমানের দাস) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ্ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নামাবলী ও গুণবাচক বিশেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ্ ও

রসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্‌ভীতি, যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ عباد হওয়া। عباد শব্দটি عبد এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ ঃ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ——অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) খুব ধীরে চলতেন না, বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كانما الارض تطوى له ——অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কুঞ্চিত হত। ---(ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষিগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ্ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উমর ফারূক (রা) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বলল ঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। ---(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মু'মিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্‌র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্-ভীতি প্রবল, যা অন্যদের ওপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের

বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরী রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ ঃ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতা-সম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جاهلون শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি, বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্‌হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تسليم শব্দটি تسلم থেকে নয়; বরং سلام থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্‌গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। —(মাযহারী)

চতুর্থ গুণ ঃ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি স্থাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবূ উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গোনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সে-ও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী بات لله ساجدا وقائما —(মাযহারী, বগভী)। হযরত উসমান গনীর জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে।—(আহমদ, মুসলিম—মাযহারী)

পঞ্চম গুণ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ—অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আখিরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটিও করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اسراف এবং এর বিপরীতে اقتار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اسراف-এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اسراف তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تبذير তথা অনর্থক ব্যয় কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ্। আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ—এ দিক দিয়ে এই তফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গোনাহ্‌র কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়।—(মাযহারী)

اقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্ ও রসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। এই তফসীরও হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ من فقه الرجل قصده فى معيشته অর্থাৎ ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ---(আহ্‌মদ, ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ما عال من اقتصد —অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার

উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।---(আহ্‌মদ, ইবনে কাসীর)

সপ্তম গুণ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ---পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গোনাহ্।

অষ্টম গুণঃ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ ---এখান থেকে কার্যগত গোনাহ্‌সমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ্ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ---অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গোনাহ্‌সমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবূ উবায়দা اَثَام শব্দের তফসীর করেছেন গোনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেনঃ اَثَام জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।---(মাযহারী)

অতপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফিরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা প্রথমে তো يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গোনাহ্‌গারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্য একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মু'মিনদের জন্য হবে না। এটা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফির ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোন মু'মিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতপর বর্ণনা করা

হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেইসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল ; কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গোনাহ্ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্ম-সমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। ---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর এর আরও একটি তফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফিররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোন সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তফ-সীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا --- বাহ্যত এটা পূর্বোক্ত إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি।

কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফির ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَآمَنَ অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল ; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يَتُوبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে,

যে ব্যক্তি তওবা করে, অতপর সৎ কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ ঃ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ—অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েম বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহ্‌রী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُونَ শব্দটিকে شَهَادَة অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ্, তা কোরআন ও সুন্নতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (র)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এ ছাড়া তার মুখে চুনকালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাযহারী)

একাদশ গুণ ঃ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا—অর্থাৎ যদি অনর্থক ও

বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। অতপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।---(ইবনে কাসীর)

দ্বাদশ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ——অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্র আয়াত ও আখিরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেই নি কিংবা দেখেই নি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্র আয়াতসমূহের ওপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। দুই. অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেই নি ও দেখেই নি অথবা আমলও করা হয় কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষিগণের তফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের ওপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক

হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্য জরুরী। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পাঠ ও কোরআন বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ অথবা কারও তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কোরআনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কোরআন ও কোরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিবর্জিত কোরআন পাঠও আল্লাহ্‌র আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তওফীক দান করুন।

ত্রয়োদশ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا —এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসাবে তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য

আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে ঃ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ---অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্য কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়---জায়েয। পক্ষান্তরে لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللَّهُ أَعْلَمُ এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মু'মিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ --- غُرْفَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোচনা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।---(বুখারী, মুসলিম-মাযহারী) মসনদ আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবূ মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে,

ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে।—(মাযহারী)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا —অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ —এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ —অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছেঃ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ —অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই।

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا —অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

و نعوذ با لله من حا ل ا هل النا ر

سورة الشعراء

সূরা আশ-শু'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ রুকূ, ২২৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِيْنَ ③ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا
خٰضِعِيْنَ ④ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ
مُعْرِضِيْنَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥
اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑦ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑨

আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

(১) তা, সীন, মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি ; অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই ; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ-বস্তু কত উদগত করেছি। (৮) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তা, সীন, মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ আপনার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়বস্তুগুলো) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তারা এতে বিশ্বাস করে না বলে আপনি এত দুঃখিত কেন যে, মনে হয়) হয়তো আপনি তাদের বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে (দুঃখ করতে করতে) আত্মঘাতী হবেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা পরীক্ষা জগৎ। এখানে সত্য প্রমাণের জন্য এমন প্রমাণাদিই কায়েম করা হয়, যার পরেও ঈমান আনা-না-আনা বান্দার ইখতিয়ারভুক্ত থাকে। নতুবা) যদি আমি (জোরে-জবরে ও বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে বিশ্বাসী করার) ইচ্ছা করি, তবে তাদের কাছে আকাশ থেকে একটি (এমন) বড় নিদর্শন নাযিল করতে পারি (যাতে তাদের ইখতিয়ারই বিলুপ্ত হয়ে যায়।) অতপর তাদের গর্দান এর সামনে নত হয়ে যাবে (এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করলে পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যাবে। তাই এরূপ করা হয় না এবং ঈমান আনার ব্যাপারটিকে জোর-জবর ও ইখতিয়ারের মাঝখানে রাখা হয়। তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে 'রহমান'-এর পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (এই মুখ ফেরানো এতদূর গড়িয়েছে যে,) তারা (সত্য ধর্মকে) মিথ্যা বলে দিয়েছে (যা মুখ ফেরানোর চরম পর্যায়। তারা শুধু এর প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ দৃষ্টিপাত না করেই ক্ষান্ত থাকেনি। এছাড়া তারা কেবল মিথ্যারোপই করেনি। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে।) সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন কোরআন ও কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ আযাব ইত্যাদির সত্যতা ফুটে উঠবে)। তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? (যা তাদের অনেক নিকটবর্তী এবং দৃষ্টির সামনে রয়েছে,) আমি তাতে কত উৎকৃষ্ট ও রকম-রকমের উদ্ভিদ উদগত করেছি। (এগুলো অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, একত্ব ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা সপ্রমাণ করে।) এতে (সত্তাগত, গুণগত ও কর্মগত একত্বের) বড় (যুক্তিপূর্ণ) নিদর্শন আছে। (এ বিষয়টিও যুক্তিপূর্ণ যে, আল্লাহ হওয়ার জন্য সত্তাগত ও গুণগত উৎকর্ষ শর্ত এবং এ উৎকর্ষতার শর্তাবলীতে অপরিহার্য হলো যে, খোদায়ীতে তিনি একক হবেন। এতদসত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস স্থাপন করে না (এবং শিরক করে। মোট কথা, শিরক করা নবুয়ত অস্বীকার করার চাইতেও গুরুতর। এতে জানা গেল যে, হঠকারিতা তাদের স্বভাবধর্মকে অকেজো করে দিয়েছে। কাজেই এরূপ লোকদের পেছনে নিজের জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না।) আর (শিরক যে আল্লাহ্র কাছে নিন্দনীয়, তাতে যদি তাদের এ কারণে সন্দেহ হয় যে, তাদের ওপর তাৎক্ষণিক আযাব আসে না কেন, তবে এর কারণ এই যে,) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী (ও পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও) পরম দয়ালু (ও)। (তাঁর সর্বব্যাপী দয়া দুনিয়াতে কাফিরদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এর ফলেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। নতুবা কুফর নিশ্চিতই নিন্দনীয় এবং আযাবের যোগ্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَاخِعٌ—لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ শব্দটি بَخْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ যবেহ্ করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌঁছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই—কোন কাফির সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হিদায়িত থেকে বঞ্চিত থাকে, তার জন্য অধিক দুঃখ না করা উচিত।

—اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ

আল্লামা যামাখশারী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فَظَلُّوْا لَهَا خٰضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফিররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اَعْنَاقٌ (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও আল্লাহ্র স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারও পক্ষে অস্বীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার ওপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আযাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।—(কুরতুবী)

زَوْجٍ كَرِيْمٍ—زوج-এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زوج বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زوج বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে বলা যায়। كريم শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ
أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي
وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ
أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ
عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا
عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾
قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ
لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا
غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾
قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾

(১০) যখন আপনার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও, (১১) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট ; তারা কি ভয় করে না ?

(১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারূনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন! (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্ বললেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফিরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই তোমার অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন। (২০) মূসা বলল, আমি সেই অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন। এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফিরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি? (২৪) মূসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। (২৭) ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। (২৮) মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? (৩১) ফিরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি তার হাত বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের কাছে তখনকার কাহিনী বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা মূসা (আ)-কে ডাকলেন (এবং আদেশ দিলেন) যে, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও, (এবং হে মূসা দেখ,) তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করে না? (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ও মন্দ, তাই তাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে।) মূসা আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি এ কাজের জন্য হাযির আছি; কিন্তু কাজটি পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী

চাই। কেননা) আমার আশংকা হচ্ছে, তারা আমাকে (বক্তব্য পূর্ণ করার আগেই) মিথ্যাবাদী বলে দেবে এবং (স্বভাবগতভাবে এরূপ ক্ষেত্রে) আমার মন হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং আমার জিহ্বা (ভালরূপ) চলে না। তাই হারূনের কাছে (ও ওহী) প্রেরণ করুন (এবং তাকে নবুয়ত দান করুন, যাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হলে সে আমার সত্যায়ন করে। এর ফলে আমার মন প্রফুল্ল ও জিহ্বা চালু থাকবে। আমার জিহ্বা কোন সময় বন্ধ হয়ে গেলে সে বক্তব্য পেশ করবে। হারূনকে নবুয়ত দান করা ছাড়াই সাথে রাখলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত; কিন্তু নবুয়ত দান করলে এ উদ্দেশ্য আরও পূর্ণরূপে সাধিত হবে।) আর (ও একটি বিষয় এই যে,) আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে; (জনৈক কিবতী আমার হাতে নিহত হয়েছিল। সূরা কাসাসে এর কাহিনী বর্ণিত হবে।) অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে (রিসালত প্রচারের পূর্বে) হত্যা করে ফেলবে। (এমতাবস্থায়ও আমি তবলীগ করতে সক্ষম হব না। সুতরাং এরও কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দিন।) আল্লাহ্ বললেন, কি সাধ্য (এরূপ করার? আমি হারূনকেও পয়গম্বরী দান করলাম। এখন তবলীগের উভয় বাধা দূর হয়ে গেল)। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও (কারণ, হারূনও নবী হয়ে গেছে)। আমি (সাহায্য দ্বারা) তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের ও তাদের যে কথাবার্তা হবে, তা) শুনব। অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, আমরা বিশ্বপালনকর্তার রসূল (এবং তওহীদের প্রতি দাওয়াতসহ এ নির্দেশও নিয়ে এসেছি) যেন তুমি বনী ইসরাঈলকে (বেগার খাটুনি ও উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের মাতৃভূমি শাম দেশের দিকে) আমাদের সাথে যেতে দাও। (এই দাওয়াতের সারমর্ম হল আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকে উৎপীড়ন ও সীমালংঘন বর্জন করা। সেমতে তারা গমন করল এবং ফিরাউনকে সব বিষয়বস্তু বলে দিল।) ফিরাউন [এসব কথা শুনে প্রথমে মূসা (আ)-কে চিনতে পেরে তাঁর দিকে মনোযোগ দিল এবং] বলল, (আহা, তুমিই নাকি) আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে তোমার সেই জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি তো নিজের সেই অপরাধ যা করবার করেছিলে (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে)। তুমি হলে বড় কৃতঘ্ন। (আমারই খেয়ে-দেয়ে আমার মানুষকে হত্যা করেছ। এখন আবার আমাকে অধীনস্থ করতে এসেছ। অথচ তোমার কর্তব্য ছিল আমার সামনে নত হয়ে থাকা)। মূসা (আ) জওয়াব দিলেন, (বাস্তবিকই) আমি তখন সেই কাজ করেছিলাম এবং আমার থেকে ভুল হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি। তার অত্যাচার সুলভ আচার-ব্যবহার দেখে তাকে বিরত রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঘটনাক্রমে সে মারা গিয়েছিল।) এরপর যখন আমি শংকিত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমাকে আমার পালনকর্তা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (এই প্রজ্ঞা ছিল নবুয়তের জরুরী অংশবিশেষ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আমি পয়গম্বরের পদমর্যাদা নিয়ে আগমন করেছি। কাজেই নত হওয়ার কোন কারণ নেই। পয়গম্বরী এই হত্যা-ঘটনার পরিপন্থী নয়; কেননা,

এই হত্যাকাণ্ড ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। এটা নবুয়তের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিপন্থী নয়। এ হচ্ছে হত্যা সম্পর্কিত আপত্তির জওয়াব। এখন রইল লালন-পালনের অনুগ্রহ প্রকাশের ব্যাপার। এর জওয়াব এই যে,) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে কঠোর অপমানে (ও উৎপীড়নে) নিক্ষেপ করে রেখেছিলে। (তাদের ছেলে-সন্তানকে হত্যা করতে, যার ভয়ে আমাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তুমি আমাকে পেয়েছিলে। এরপর আমি তোমার লালন-পালনে ছিলাম। অতএব তোমার জুলুমই লালন-পালনের আসল কারণ। এমন লালন-পালনেরও কি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে হয়? বরং এই অশালীন কাজের কথা স্মরণ করে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।) ফিরাউন (এতে নিরুত্তর হয়ে গেল এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে) বলল, (যাকে তুমি) 'রাব্বুল আলামীন (বল; যেমন বলেছ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ এ) আবার কি? মূসা (আ) বললেন, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তুমি এর বিশ্বাস (অর্জন) করতে চাও, (তবে এতটুকু সন্ধান যথেষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন হলে-গুণাবলীর মাধ্যমেই জওয়াব দেওয়া হবে।) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কিছু শুনছ? (প্রশ্ন কিছু, জওয়াব অন্য কিছু) মূসা (আ) বললেন, তিনি পালনকর্তা তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের। (এই জওয়াবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পুনরুক্তি আছে; কিন্তু) ফিরাউন (বুঝল না এবং) বলল, তোমাদের এই রসূল যে (নিজ ধারণা অনুযায়ী) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, বদ্ধ পাগল (মনে হয়)। মূসা (আ) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের পালনকর্তা এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আছে, তারও, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে একথা মেনে নাও); ফিরাউন (অবশেষে বাধ্য হয়ে) বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষেপ করব। মূসা (আ) বললেন, যদি আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পেশ করি, তবুও (মানবে না)? ফিরাউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে সেই প্রমাণ পেশ কর। তখন মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করলে তা মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা প্রদর্শনের জন্য) নিজের হাত (বুকের কলারে দিয়ে) বের করতেই তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে সুশুভ্র হয়ে গেল। (অর্থাৎ একেও সবাই চর্মচক্ষে দেখল।)

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়, বরং বৈধ ; যেমন মূসা (আ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ, মূসা (আ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মূসা (আ)-র জন্য ضلال শব্দের অর্থ : قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ — তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ; ফিরাউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আ) বললেন : হ্যাঁ, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না ; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সার কথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাতে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া হযরত কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ضلال শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমান্বিত আল্লাহ্র সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর নয় : قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ—এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্র স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ, ফিরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আ) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা। (রূহুল মা'আনী)

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ—বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফিরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন-যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। মূসা (আ) ফিরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি ঃ দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হারূন (আ) যখন ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে মূসা (আ)-র ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল; যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। এখানেও ফিরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। এক. তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল? দুই. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘ্নতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ)-র পয়গম্বর-সুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফিরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত, পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফিরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

হযরত মূসা (আ) জওয়াবে একথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে; কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি

লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা অতপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন মূসা (আ)-র সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতও কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ)-র স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ্ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফিরাউনের দরবার কোথায়! যে কারণের ওপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশংকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গম্বরসুলভ জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মু'জিযা দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুইজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবার ফিরাউনের, শহর ও দেশ ফিরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশংকা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গম্বরগণের বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ
اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ
حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ
السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ
اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ
وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى
عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ
لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ
اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

---

(৩৪) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ যাদুকর। (৩৫) সে তার যাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ

দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতপর এক নির্দিষ্ট দিনে যাদুকরদেরকে একত্র করা হল। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) যাতে আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি—যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন যাদুকররা আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো? (৪২) ফিরাউন বলল, হ্যাঁ এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। (৪৪) অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফিরাউনের ইযযতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (৪৬) তখন যাদুকররা সিজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের রব। (৪৯) ফিরাউন বলল, আমার অনুমতিদানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হযরত মূসা (আ) কর্তৃক এসব মু'জিযা প্রদর্শিত হলে] ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইনি একজন সুদক্ষ যাদুকর। তার (আসল) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর যাদু বলে (নিজে শাসক হয়ে যাবেন এবং) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবেন, (যাতে বিনা প্রতিবন্ধকতায় স্বগোত্রকে নিয়ে রাজ্য শাসন করতে পারে,) অতএব তোমরা কি পরামর্শ দাও? পারিষদবর্গ বলল, আপনি তাঁকে ও তাঁর ভাইকে (কিঞ্চিৎ) অবকাশ দেন এবং (নিজ দেশের) শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে (হুকুমনামা দিয়ে) প্রেরণ করুন, যাতে তারা (সব শহর থেকে) সব সুদক্ষ যাদুকরকে (একত্র করে) আপনার কাছে উপস্থিত করে। অতপর এক নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ সময়ে যাদুকরদেরকে একত্র করা হল। (নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ সাজসজ্জার দিন এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ চাশ্‌তের সময়; যেমন সূরা তোয়াহার তৃতীয় রুকূর শুরুতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত সবাইকে সমবেত করা হল এবং ফিরাউনকে এর সংবাদ জানিয়ে দেয়া হল।) এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঘোষণার মাধ্যমে) জনগণকে বলে দেওয়া হল যে, তোমরাও কি (অমুক স্থানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য) একত্র হবে? (অর্থাৎ একত্র হয়ে যাও।) যাতে যাদুকররা জয়ী হলে (যেমন

প্রবল ধারণা তাই) আমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করি। (ফিরাউন এ পথে ছিল এবং অপরকেও এ পথে রাখতে চাইত। উদ্দেশ্য এই যে, একত্র হয়ে দেখ। আশা করা যায় যে, যাদুকররাই বিজয়ী হবে। তখন আমাদের পথ যে সত্য তা সপ্রমাণ হয়ে যাবে।) অতঃপর যখন যাদুকররা (ফিরাউনের সামনে) আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল যদি আমরা [মূসা (আ)-র বিপক্ষে] বিজয়ী হই, তবে আমরা কোন বড় পুরস্কার পাব তো? ফিরাউন, বলল, হ্যাঁ, (আর্থিক পুরস্কারও বড় পাবে) এবং (তদুপরি এই মর্যাদাও লাভ করবে যে) তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [এইরূপ কথাবার্তার পর তারা প্রতিযোগিতার স্থানে আগমন করল এবং অপরদিকে মূসা (আ) আগমন করলেন। প্রতিযোগিতা শুরু হল। যাদুকররা বলল, আপনি প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করব] মূসা (আ) বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, (ময়দানে) নিক্ষেপ কর। অতএব তারা তাদের রাশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, (যা যাদুর প্রভাবে সর্প মনে হচ্ছিল) এবং বলল, ফিরাউনের ইয্যতের কসম, নিশ্চয় আমরাই জয়ী হব। অতঃপর মূসা (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা (অজগর হয়ে) তাদের সব অলীক কীর্তিকে গ্রাস করতে লাগল। অতঃপর (এ দৃশ্য দেখে) যাদুকররা (এমন মুগ্ধ হল যে,) সবাই সিজদাবনত হয়ে গেল এবং (চিৎকার করে) বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যিনি মূসা ও হারূন (আ)-এরও রব। ফিরাউন (অত্যন্ত বিচলিত হল যে, কোথাও সমস্ত প্রজাসাধারণই মুসলমান না হয়ে যায়! সে একটি বিষয়বস্তু চিন্তা করে শাসানির সুরে যাদুকরদেরকে) বলল, তোমরা কি আমার অনুমতি দানের পূর্বেই মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? নিশ্চয় (মনে হয়,) সে (যাদুবিদ্যায়) তোমাদের সবার ওস্তাদ, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (আর তোমরা তার শিষ্য। তাই পরস্পর গোপনে চক্রান্ত করেছ যে, তুমি এমন করলে আমরা এমন করব এবং এভাবে হারজিত প্রকাশ করব, যাতে কিবতীদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا অতএব) শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। (তা এই যে) আমি তোমাদের এক-দিকের হাত ও অন্যদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শূলে চড়াব (যাতে আরও শিক্ষা হয়)। তারা জওয়াব দিল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালন-কর্তার কাছে পৌঁছে যাব (সেখানে সব রকমের শান্তি ও সুখ আছে)। সুতরাং এরূপ মৃত্যুতে ক্ষতি কি?) আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা (এস্থলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে) সর্বাগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি (সুতরাং এতে এরূপ সন্দেহ হতে পারে না যে, তাদের পূর্বে 'আসিয়া' ফিরাউন বংশের মু'মিন ও বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ —অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) যাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা যাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে মূসা (আ) তাদেরকে যাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা মূসা (আ)-র পক্ষ থেকে যাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি যাদুকরদেরকে যাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন কোন আল্লাহ্‌দ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আল্লাহ্‌দ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, একে আল্লাহ্ দ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ —এ বাক্যটি যাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতা যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহ্‌র কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। (রূহুল মা'আনী)

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ —অর্থাৎ যখন ফিরাউন যাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন যাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, কর। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন যাদুর কুফরে লিপ্ত, ফিরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফিরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই যাদুকররা মূসা (আ)-র মু'জিযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ তোমার যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আ)-রই মু'জিযা, যা লাঠি ও সুশুভ্র

হাতের মু'জিযার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফিরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মু'মিনই নয়, বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ
فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُم
مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَ
أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ
قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾
فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَ أَنجَيْنَا مُوسَىٰ
وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

(৫২) আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিশ্চয় এরা (বনী ইসরাঈল) ক্ষুদ্র একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (৫৬) এবং আমরা সবাই সদা শঙ্কিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফিরাউনের দলকে তাদের বাগবাগিচা ও ঝরনাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম। (৫৮) এবং ধনভাণ্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করে দিলাম এ সবের মালিক। (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সংগীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। (৬২) মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা

সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। (৬৫) এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন ফিরাউন এ ঘটনা থেকেও হিদায়ত লাভ করল না এবং বনী ইসরাঈলের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করল না, তখন) আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাগণকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) রাত্রিযোগে (মিসর থেকে) বাইরে নিয়ে যাও এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (সেমতে তিনি আদেশ মত বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে রাত্রিযোগে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সকালে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে পড়লে) ফিরাউন (পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আশেপাশের) শহরে শহরে সংগ্রাহক দৌড়িয়ে দিল এবং বলে পাঠাল) যে, তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাদের তুলনায়) একটি ক্ষুদ্র দল। (তাদের মুকাবিলা করতে কেউ যেন ভয় না করে) তারা (নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা) আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (কার্যকলাপ এই যে, গোপনে চাতুরী করে বের হয়ে গেছে অথবা ধারের বাহানায় আমাদের অনেক অলংকারও সাথে নিয়ে গেছে। মোটকথা, তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত। আমরা সবাই একটি সশস্ত্র দল (এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী)। মোটকথা, (দু'চার দিনে সাজ-সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে ফিরে আসতে পারবে না, এ কল্পনাও তাদের ছিল না। এ দিক দিয়ে যেন) আমি তাদেরকে বাগ-বাগিচা থেকে, ঝরনাসমূহ থেকে, ধনভাণ্ডার থেকে এবং সুরম্য অট্টালিকাসমূহ থেকে বহিষ্কার করে দিলাম। (আমি তাদের সাথে) এরূপই করেছি এবং তাদের পরে বনী ইসরাঈলকে এগুলোর মালিক করে দিয়েছি। (এ ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতঃপর আবার কাহিনী বর্ণিত হচ্ছেঃ) মোটকথা, (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল (অর্থাৎ কাছাকাছি পৌঁছে গেল। বনী ইসরাঈল তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার ফিকিরে ছিল)। অতঃপর যখন উভয় দল (এমন নিকটবর্তী হল যে,) পরস্পরকে দেখল, তখন মূসা (আ)-র সংগীরা (অস্থির হয়ে) বলল, (হে মূসা,) আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়; কারণ, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি এখনই আমাকে (সাগর পাড়ি দেয়ার) পথ বলে দেবেন। (কেননা, রওয়ানা হওয়ার সময়ই মূসা (আ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল যে, সমুদ্রে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হবে فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ

دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى তবে শুষ্ক কিরূপে হবে, তা তখন বলা হয়নি। সুতরাং মূসা (আ) এই ওয়াদার কারণে নিশ্চিত ছিলেন এবং বনী ইসরাঈল উপায় জানা না থাকার কারণে অস্থির ছিল।) অতঃপর আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম, লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। সেমতে (তিনি আঘাত করলেন। ফলে) তা বিদীর্ণ হয়ে (কয়েক অ হয়ে) গেল। (অর্থাৎ কয়েক জায়গা থেকে পানি সরে গিয়ে মাঝখানে একাধিক সড়ক খুলে গেল।) প্রত্যেক অংশ বিশাল পর্বতসদৃশ (বড়) ছিল। (তারা নিরাপদে ও শান্তিতে সমুদ্র পার হয়ে গেল।) আমি অপর দলকেও তথায় পৌঁছিয়ে দিলাম (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার দলবলও সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেল এবং وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا—এই সাবেক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমুদ্র তখন পর্যন্ত তদবস্থায়ই ছিল। তারা খোলা পথকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে গোটা বাহিনীকে পথে নামিয়ে দিল। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে পানি নেমে আসতে লাগল এবং সমগ্র বাহিনী সলিল সমাধি লাভ করল। কাহিনীর পরিণাম হল এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে ও তাঁর সংগীদেরকে (নিমজ্জিত হওয়া থেকে) উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে (অর্থাৎ তাদের প্রতিপক্ষকে) নিমজ্জিত করে দিলাম। এ ঘটনায়ও বড় শিক্ষা আছে (অর্থাৎ কাফিররা এর দ্বারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী ও পয়গম্বরদের বিরোধিতা আযাবের কারণ। একথা বুঝে তারা বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।) কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত পরাক্রমশালী (ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই আযাব দিতেন; কিন্তু) পরম দয়ালু। (তাই ব্যাপক দয়ার কারণে আযাবের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আযাবের বিলম্ব দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ—এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফির জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ্ প্রান্তরেই তাদের উভয়